॥ ওতম্ ॥

প্রাণায়াম বিধি

মহাত্মা নারায়ণ স্বামী

॥ ওতম্ ॥

প্রাণায়াম বিধি

মহাত্মা নারায়ণ স্বামী
প্রণীত

অনুবাদক
আচার্য প্রিয়দর্শন

বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ
[সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে]

মুক্তির উত্তম সাধন উপাসনা

"যুঞ্জন্তি ব্রঘ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থূষঃ।

রোচন্তে রোচনা দিবি ।।"

[ঋগ্বেদ ১।৬।১]

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাবতীয় পদার্থ সিদ্ধির মুখ্য হেতু যে প্রাণ; সেই প্রাণকে প্রাণায়াম রীতি অনুসারে অত্যন্ত প্রীতির সহিত পরমেশ্বরে যুক্ত করেন। এ কারণ তাঁহারা মোক্ষ লাভ করিয়া সদা আনন্দে থাকেন।

— ***স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী***

পরিচিতি

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতি রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥"

[গীতা ৪।২৯]

"অপর যোগীগণ প্রাণ ও অপানের গতিকে রুদ্ধ করিয়া, প্রাণায়াম পরায়ণ হন, আবার অপানে প্রাণের হবন করিয়া থাকেন। এইভাবে প্রাণে-অপানের হবনো করিয়া অর্থাৎ রেচক, পুরক ও কুম্ভক এই অবয়বত্রয়ে বিভক্ত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।"

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কেবল মাত্র অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত যেরূপ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই রূপ প্রাণায়াম বিষয়ে ও কুশল যোগীর যোগাভ্যাস জন্য স্বীয় অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছেন।

'প্রাণায়াম বিধি' পুস্তিকায়, মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ ও তাঁহার যোগাভ্যাসের জন্য অনুভব মানব হিতার্থে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশিত হইল।

— *আচার্য্য প্রিয়দর্শন*

ও৩ম্

প্রাণায়াম বিধি

প্রথম অধ্যায়

অষ্টাঙ্গ যোগের "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি" [১] এই আটটি অঙ্গের প্রথম পাঁচটি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন অর্থাৎ **বহিরঙ্গ** সাধনা এবং শেষের তিনটি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি **অন্তরঙ্গ** সাধন নামে প্রসিদ্ধ।

এই অন্তরঙ্গ সাধন, সম্প্রজ্ঞাত সাধনের অসাক্ষাৎ সাধন [২]। প্রথমের পাঁচটিকে বহিরঙ্গ এবং শেষের তিনটিকে অন্তরঙ্গ সাধন কেন বলা হয় ? ইহার কারণ এই যে, বহিরঙ্গ সাধন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার উন্নতি লাভ হয়। ইহাও সত্য যে, অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা কেবল মানসিক ও আত্মিক উন্নতি হয়। কিন্তু [৩] অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা যে আত্মিক উন্নতি হয় তা অতি উচ্চস্তরের সাধনা এবং তাই এক প্রকারের অসম্প্রজ্ঞাত (নির্বীজ) সমাধির সাধনা; যদি সাক্ষাৎ না হয় তো – অসাক্ষাৎ তো বটেই।

এই ছোট্ট একটি পুস্তিকায় যোগের অন্তরঙ্গ সাধন সমূহের আলোচনা করা হবে না। সে কারণ, বহিরঙ্গ সাধন সমূহের আলোচনা ইহার দ্বারা করা হবে। কিন্তু কেবল ইহার চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম সম্বন্ধে ততটুকুই আলোচনা করা হবে, যতটুকুতে যোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেও অভিরুচি সৃষ্টি হয়, এবং তাঁরা প্রারম্ভিক সাধন (প্রাণায়াম) আরম্ভ করতে সক্ষম হয়।

~~~~~~

১। যোগ দর্শন সূত্র ৩/৭ ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। যোগ দর্শন সূত্র ৩/৮।

৩। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনের পার্থক্য দেখান হইয়াছে, কেবল মাত্র উভয় প্রকার সাধনের প্রকার ভেদ প্রদর্শন করানোর জন্য। ইহা দ্বারা কোনও সাধনের অসম্মান বা ছোট বড় দেখানো, এ ভাব নিয়ে বলা হয় নাই। যোগের আটটি অঙ্গ আপন আপন স্থানে আপন আপন প্রয়োজন পূর্ণ করে।
~~~~~~

ইহা পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবাসী আর্যজাতির সুসন্তান, আর্যজাতির বংশধর আপন পূর্ব পুরুষদের অর্জিত বিদ্যা যোগ সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন ও অনভিজ্ঞ। বাস্তবিক পক্ষে প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানই (Eastern Psychology) যোগ যোগদর্শনের সূত্র এবং ব্যাসমুনি কৃত যোগ সূত্রের ভাষ্য হইতে শরীরের অন্তরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গের (অন্তঃকরণের) জ্ঞানলাভ করা যায়। এবং কি উপায়ে উহার উন্নতি সাধন করা যেতে পারে ইহারও জ্ঞানলাভ করা সম্ভব।

পাশ্চাত্য মনীষিগণকে (Western Psychology) যেখানে **'চিৎ'** (Mind Brain) অন্তঃকরণ বা মস্তিষ্ক বলে, সেখানে পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিক তার সামাধান করিতে অক্ষম।

তাঁরা উহাকে অলৌকিক বলিয়া (mystery) উড়িয়ে দেয়। কিন্তু প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানে (যোগ) এ প্রশ্ন ওঠে না। উহাতে স্পষ্টরূপে প্রত্যেক সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের কথা বলা হয়েছে এবং অভ্যাসের অন্তর্গত এত সাধন রেখেছে যাতে অতি আয়াসেই আত্মজগতে প্রবেশ করে জীবনের শেষ উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে। যাই হোক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করে এবার পুস্তকের বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করা যাক।

এতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, যোগের প্রারম্ভিক অঙ্গ দ্বারা মানসিক উন্নতির অতিরিক্ত শারীরিক উন্নতিও হয়। সর্বপ্রথম ইহার প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া যাক এই সাধন সমূহের মধ্যে প্রথমে যম ও নিয়ম দ্বারা কিভাবে শারীরিক উন্নতি হয় সেই বিষয়ই আলোচনা হচ্ছে।

যম নিয়ম ও শারীরিক উন্নতি

যম পাঁচ প্রকার – ১. অহিংসা, ২. সত্য, ৩. অস্তেয়, ৪. ব্রহ্মচর্য, ৫. অপরিগ্রহ, (অস্তেয় = চৌর্যত্যাগ), (অপরিগ্রহ = লোভী না হওয়া)।

নিয়ম পাঁচ প্রকার – ১. শৌচ, ২. সন্তোষ, ৩. তপ, ৪. স্বাধ্যায়, ৫. ঈশ্বর প্রণিধান। (ঈশ্বর প্রণিধান = ঈশ্বর ভক্তি)

~~~~~~

উদ্যম = পুরুষার্থ বিষয়ে সন্তোষ ভাব হলো আলস্য। উদ্যম অর্থাৎ পুরুষার্থ দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়াই হলো সন্তোষ।
~~~~~~

এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম 'অহিংসা'কেই ধরা যাক অহিংসা দ্বারা শারীরিক উন্নতি কিভাবে হয়ে থাকে প্রথমে তাই বলছি।

অহিংসা ও শারীরিক উন্নতি

যে ব্যক্তি অহিংসা পালন করবে তাঁর পক্ষে অহিংসক হওয়া কর্তব্য। হিংসা অবলম্বন করলে মানুষের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি বৃত্তিসমূহ মাথা তুলে ওঠে। এই সমস্ত বৃত্তির জাগৃতিতে সে যা কিছু ভোজন করবে তা পরিপাক হইবে না [১]।

ভুক্তবস্তু পরিপাক না হলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য আদি রোগ সৃষ্টি হবে। পরিণাম স্বরূপ শারীরিক উন্নতি না হৈ রোগী হয়ে পড়বে। তাছাড়া শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে অবনত অবস্থা দেখা দিবে। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে, অহিংসা পালন দ্বারাই শারীরিক প্রয়োজনীয়তা ও শারীরিক উপকারিতা সিদ্ধ হয়ে থাকে। এই ভাবে অবশিষ্ট যম এবং নিয়মের বিষয় সম্বন্ধে বিচার করা যেতে পারে। যাই হোক ইহা সিদ্ধ হলো যে, নিয়মও শারীরিক উন্নতির হেতু বা কারণ।

আসন ও শারীরিক উন্নতি

যেভাবে বসলে স্থির সুখ হয় তাই আসন।[২] স্থির সুখ লাভের জন্য শরীরকে নীরোগ রাখা প্রয়োজন। নীরোগ হতে হলে শীর্ষাসন, সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন প্রভৃতি অভ্যাস করা হয়। এই সমস্ত আসন দ্বারা বহুবিধ ব্যাধি দূর হয়। শুধু তাই নয়, নানা প্রকার শারীরিক উন্নতিও লাভ হয়ে থাকে।

~~~~~~

১। ঈর্ষ্যাভয়ক্রোধ পরিপ্লবনলুব্ধেন রোগদৈন্যনিপীড়িতেন।

প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি॥

(মাধব নিদান ৩-৮)

২। যোগদর্শন ২/৪৬।
~~~~~~

আসন দ্বারা শারীরিক উন্নতি হবার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ বলে এ বিষয়ে অধিক লেখা প্রয়োজন বোধ করি না। এবার যোগেরে তিন অঙ্গ বিষয়ে বলবার পর যোগের চতুর্থ অঙ্গ **'প্রাণায়াম'** বিষয়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উচিত বলে, সেই বিষয়েই লেখা হচ্ছে। প্রণায়াম সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রকৃত বিষয়কেই নেওয়া হোক যে, এই প্রাণায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধন কিভাবে হয়ে থাকে।

প্রাণায়াম ও শারীরিক উন্নতি

প্রাণায়ামের অনুশীলন দ্বারা কিভাবে শারীরিক উন্নতি হয় এই বিষয়টি জানতে হইলে প্রথমত শরীরের অভ্যন্তরস্থিত কার্য সমূহের ক্রিয়মান অনিচ্ছিত কার্য সমূহ, আমাদের হৃদয় ও ফুসফুসের ক্রিয়ার উপর আলোকপাত করতে হবে।

হৃদয়ের স্থূল কার্য

এই শরীরে দুই প্রকারের অতি সূক্ষ্ম নালি আছে। একটি সমস্ত শরীর ঘুরে হৃদয়ে আসে, আর অপরটি হৃদয় হতে সমস্ত শরীরে যায়। প্রথমটির নাম **'শিরা'** এবং দ্বিতীয়টির নাম **'ধমনি'**।

'শিরার' ক্রিয়া, সমস্ত শরীরের অশুদ্ধ রক্তকে পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া, আর হৃদয় সেই অশুদ্ধ রক্তকে পরিশুদ্ধ করে সেই পরিশুদ্ধ রক্তকে ধমনির সাহায্যে সমস্ত শরীরে আবার পৌঁছে দেওয়া।

রক্ত অশুদ্ধ হয় কেন ? ইহার কারণ এই যে, পরিশুদ্ধ রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কর্মে প্রযুক্ত হয় এবং সেই প্রযুক্ত রক্ত আবার অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ভাবে হৃদয় হতে পরিশুদ্ধ রক্ত সমস্ত শরীরে এরং অপরিশুদ্ধ রক্ত আবার পরিশুদ্ধ হবার জন্য হৃদয়ের ফিরে আসে। প্রতি মূহুর্তে এই ক্রিয়া চলমান।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের ভেদ

শুদ্ধ রক্ত সামান্য চকচকে ভাবের হয় এবং বেশ গাঢ় লাল রঙের রূপে দেখা যায়। কিন্তু যখন রক্ত অশুদ্ধ হয়, তখন তাতে সামান্য মলিনতা আসে। শুদ্ধ রক্তে অক্সিজেন (Oxygen) প্রচুর মাত্রায় থাকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে যখন সেই রক্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাতে অক্সিজেনের মাত্রা নাম মাত্র থেকে যায় এবং তৎস্থলে এক বিষাক্ত বায়ু (Carbonic Acid Gas) রক্তে সঞ্চারিত হয়। এই পরিবর্তন দ্বারাই রক্তে একটু মলিনতা আসে।

ফুসফুসের কাজ

শিরার সাহায্যে অশুদ্ধ রক্ত যখন হৃদয়ে পৌঁছায় সেই সময় হতে ফুসফুসে ক্রিয়া আরম্ভ হতে থাকে। ফুসফুসকে দেখতে অনেকটা স্পঞ্জের ন্যায়। স্পঞ্জে যেমন অসংখ্য প্রকোষ্ঠ (Cells) থাকে সেইরূপ ফুসফুসেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (Cells) থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন যে, যদি ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলিকে সারি সারি লম্বা চওড়া ভাবে বিস্তৃত করে রাখা যায়, তাহলে তার বিস্তার ১৪ হাজার বর্গ ফিট হবে। এই কর্ণগুলি একটি মাংস পেশী (Diaform) । ইহা মুক্ত এবং বন্ধ হয়ে যায়। যখন এই কর্ণগুলি মুক্ত হয়, তখন একদিক হৃদয় হতে অশুদ্ধ রক্ত এবং অন্যদিক হতে শ্বাস দ্বারা গৃহীত শুদ্ধবায়ু উভয়ে মিলিত হয়ে তাকে পূর্ণ করে দেয়। এইভাবে অশুদ্ধ রক্ত, শুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে এসে একাকার হয়ে যায়।

প্রকৃতির এক বিলক্ষণ নিয়ম (অশুদ্ধ রক্ত + শুদ্ধ বায়ু) অনুসারে ইহা নিরন্তর ক্রিয়াশীল। বিলক্ষণ নিয়মটি হলো — যার মধ্যে যে বস্তুটির অভাব সে উহাকে দূর হতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। রক্তে শুদ্ধ বায়ু নাই (Oxygen) এবং শ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ুতে কার্বন (Carbon) নাই — এই দুইটির মধ্যে যখন উপরোক্ত নিয়ম কর্ম করতে থাকে তখন তার

পরিণাম এইরূপ হয় – রক্ত হতে কার্বন বায়ু বের হয়ে শ্বাস বায়ুতে এবং প্রশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ু হতে অক্সিজেন এসে রক্তে মিশে যায়। ইহার ফলে রক্ত শুদ্ধ হয় এবং শ্বাস দ্বারা আগত বায়ু অশুদ্ধ হয়ে যায়।

শুদ্ধ রক্ত হৃদয়ে গিয়ে ধমনি সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় আর অশুদ্ধ বায়ু নিঃশ্বাসের দ্বারা বের হয়ে যায়। এই ক্রিয়া সর্বদা চলতে থাকে।

হৃদয়ের স্পন্দন

হৃদয়ে স্পন্দন হয় কেন ? একবার হৃদয় হতে অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হবার জন্য ফুসফুসে যাওয়া, এবং ফুসফুস হতে শুদ্ধ রক্ত হৃদয়ে ফিরে আসা, এই দুই ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ে স্পন্দন হয়। In avarage পুরুষ হৃদয়ে এক মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন হয়ে থাকে। বিশেষ অবস্থায় বয়সের তারতম্য অনুসারে স্পন্দনের মাত্রায় ন্যূনাধিক্য হয়ে থাকে। তবে, সাধারণত এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে একবার অশুদ্ধ রক্ত, শুদ্ধ হবার জন্য ফুসফুসে আসে এবং শুদ্ধ হয়ে পুনরায় হৃদয়ে ফিরে যায়। একটি শরীরে বৈজ্ঞানিক হিসাব করে দেখেছেন যে, এইভাবে ২৪ ঘন্টায় ২৫২ মন রক্ত হৃদয় হতে ফুসফুসে যায় এবং এই পরিমাণ রক্ত শুদ্ধ হয়ে ফুসফুস হতে হৃদয়ে ফিরে আসে। এই স্পন্দনের শব্দ হয় **'লবু-ডপ'** উচ্চারণের মত। যখন হৃদয় সংকুচিত হয় রক্ত বাহিরে আসে তখন শব্দ হয় **'লুব'** ধ্বনির মত, আর যখন হৃদয় বিস্তৃত হয়ে উহাতে রক্ত গৃহীত হয় তখন শব্দ **'ডপ'** ধ্বনির মত। এই উক্ত প্রকার ধ্বনির ব্যবধান অবশ্যই থাকে। পরন্তু সে সময়ের ব্যবধান এতই অল্প যে, মনে হয় যেন শব্দ একই সময়ে ধ্বনিত হচ্ছে। বিশেষ বস্তু যন্ত্র ব্যতীত এই ব্যবধান বুঝতে পারা যায় না। যাই হোক এবার বিচারণীয় এই যে —।

ফুসফুসে শুদ্ধ বায়ু প্রবেশ না করার পরিণাম

যদি হৃদয় হতে অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হবার জন্য ফুসফুসে যায় কিন্তু শ্বাস দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বায়ু ফুসফুসে না আসে, বা সমস্ত কোষ সমূহে যেখানে রক্ত পৌঁছয় সেখানে শুদ্ধ বায়ু না

পৌঁছায়, তাহলে তাহার পরিণাম কি হবে ?

ফুসফুসের প্রধানতঃ তিনটি ভাগ আছে।

(১) উপরিভাগ, যা প্রায় গলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(২) মধ্যভাগ, যা দুই দিকে হৃদয়ের এদিকে ওদিকে আছে।

(৩) নিম্নভাগ যা 'ডায়োফর্ম' মাংস পেশীর উপর দুই দিকে আছে।

সাধারণ রীতি অনুসারে যে শ্বাস গ্রহণ করা হয় তা পর্যাপ্ত হয় না, এই কারণে ফুসফুসের সমস্ত ভাগের অথবা সমস্ত অংশের কোষ সমূহে পৌঁছাতে পারে না। যখন ফুসফুসের উপরি অংশে শ্বাস দ্বারা বায়ু না পৌঁছায়, তখন ফুসফুসের উপরি অংশ রোগাক্রান্ত হতে আরম্ভ করে এবং ঐ অংশে দোষ দেখা দেওয়ায় এক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়, যাকে যক্ষ্মা বা Tuberculosis বলে। এই ভাবে ফুসফুসের নিম্ন ও মধ্য অংশটুকু যখন অকেজো ও দোষ পূর্ণ হতে থাকে, তখন পরিণাম স্বরূপ কাশি, হাঁপানী দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, নিমোনিয়া, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি ফুসফুস সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হতে থাকে।

এই ভাবে প্রচুর পরিমাণে বায়ু ফুসফুসে না পৌঁছানোর দরুন, যেখানে একদিকে ফুসফুস সম্বন্ধিত রোগ উৎপন্ন হয় আর —

এক ভয়ঙ্কর পরিণাম

অপর দিকে ইহাও সৃষ্টি হয় যে, হৃদয় হতে যে অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হবার জন্য ফুসফুসে আসে তা শুদ্ধ না হয়ে অশুদ্ধ অবস্থায় সেখান হতে ধমনি সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে পৌঁছে যায়। ইহার পরিণাম রক্তবিকার রক্তবিকৃত হলে সাধারণ রোগ-চুলকানি হতে আরম্ভ করে ভয়ঙ্কর কুষ্ঠ ব্যাধি পর্যন্ত হয়ে যায়।

অতএব এই সমস্ত দুষ্পরিণামের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজন বায়ুর দ্বারা ফুসফুসকে পূর্ণ রাখা এবং এরূপ কোনো কোষ থাকবে না, যাতে বায়ু পৌঁছায় নি। এখান

থেকেই প্রাণায়ামের প্রয়োজনীয়তা আরম্ভ।

প্রাণায়ামের প্রয়োজন

প্রাণায়ামের সাহায্যে মানুষ যখন ভিতরের শ্বাসকে বাহিরে রুদ্ধ করে দেয় তখন তার মধ্যে শ্বাস গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা জন্মে। এর ফলে শ্বাস ভিতরে প্রবেশ করবার সময় শ্বাস সবেগে প্রবল বায়ুর বন্যা অথবা ঝড়ের ন্যায় ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয় এবং যেরূপ ঝড় বা প্রবল বায়ু নগরের কোণে কোণে প্রবেশ করে, সেইরূপ সবেগে শ্বাস দ্বারা ভিতরে গৃহীত বায় ফুসফুসের প্রতিটি কোণে প্রবেশ করে। সে কারণে রক্তে কোনো প্রকার দোষ, অথবা বিকার উৎপন্ন হতে পারে না।

যাই হোক দেখা গেল যে, প্রাণায়ামকে শুধু শারীরিক উন্নতির হেতু না বলে মুখ্য হেতু বা কারণ বলাই ঠিক। এই কারণে প্রাণায়াম করা আবশ্যক। ইহা স্পষ্ট যে, প্রাণায়াম যেখানে শারীরিক উন্নতির সাধন, সেখানে মানসিক উন্নতিরও মুখ্য সাধন। প্রাণায়াম কি, এবং কি ভাবে করা উচিত, এ বিষয় জানবার ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একথা বলার পূর্বে তার কতিপয় সাধনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই সাধন সমূহকে ক্রিয়াত্মক রূপে আচরণ করলে প্রাণায়ামের ক্রিয়ায় শীঘ্রই সফলতা লাভ করা যায়।

কোনো কোনো সজ্জন বলে থাকেন যে, প্রাণায়াম করে তাঁর এই কষ্ট হয়েছে, ঐ কষ্ট হয়েছে, অমুক রোগ হয়েছে ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত ক্লেশ যাই হোক না কেন, তা প্রাণায়ামের কারণে হয় নাই, কিন্তু তা অভ্যাসীর অসাবধানতার জন্য হয়ে থাকবে। যত সময় প্রাণায়াম অভ্যাসকারী বিধি পূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস না করবে, তত সময় তা ফলদায়ক হবে না। চিকিৎসা যেরূপ যথাযথ পথ্য [ঔষধ] ব্যতীত ফলদায়ক হয় না, সেইরূপ বিধিহীন প্রাণায়ামও ফলদায়ক হয় না।

যে সাধন দ্বারা প্রাণায়াম ফলদায়ক হয়, সেগুলি জেনে রাখা প্রয়োজন। কেননা, সেইগুলি প্রাণায়ামের পক্ষে ফলপ্রদ।

প্রাণায়ামের উপযোগী সাধন

১। প্রথম সাধন —

প্রাণায়াম অভ্যাসীর মন, শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। মন শুদ্ধ করবার জন্য শুদ্ধ অন্ন সেবন করা প্রয়োজন। পরিশ্রম ও সৎপথে উপার্জিত ধনের অন্নই শুদ্ধ অন্ন। প্রবঞ্চনা ও কপটতা দ্বারা উপার্জিত অন্ন খাইয়া কোনল সাধক বা অভ্যাসী সফলতা লাভ করতে পারবে না। কেননা, এতাদৃশ অন্ন ভক্ষণে হৃদয় সদা মলিন থাকে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ – যম। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান – নিয়ম।

২। দ্বিতীয় সাধন —

প্রতিদিন যম ও নিয়মের চিন্তন ও অনুশীলন করা উচিত। স্বীয় কৃত কর্মের যে সমস্ত কর্ম অনুশীলনের প্রতিকূল, সেগুলি দ্বারা হৃদয়ে গ্লানি উৎপন্ন হতে পারে। অতএব তদ্রূপ কর্ম পরিত্যাগ করবার জন্য সর্বদা যত্নশীল থাকতে হবে।

৩। তৃতীয় সাধন —

নাসিকা দ্বারা শ্বাস নেওয়ার অভ্যাস, করা উচিত। কেউ কেউ মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে থাকে, এরূপ অভ্যাস হানিকর জানবে।

৪। চতুর্থ সাধন —

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের অভ্যাস করা উচিত।

৫। পঞ্চম সাধন —

কোন ঋতুতেই মুখ ঢেকে শয়ন করা উচিত নয়। শ্বাস দ্বারা শুদ্ধবায়ু ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অন্ততঃ নাসিকা সদৈব খুলে রাখা প্রয়োজন।

৬। ষষ্ঠ সাধন —

যেখানে ধোঁয়া, ধূলি প্রভৃতি হানিকর পদার্থ থাকেনা, সেই রূপ শুদ্ধ এবং শান্ত স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত।

৭। সপ্তম সাধন —

যাতে অজীর্ণ না হয় সে কারণ পেটের এক কোণ খালি রেখে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রেখে স্বল্প আহার করা উচিত।

৮। অষ্টম সাধন —

রোগগ্রস্ত অবস্থায় প্রাণায়াম আরম্ভ করবে না। উক্ত সাধনগুলির প্রতি লক্ষ্য থাকলে এবং এগুলোর অনুকূলে চললে মানুষের হৃদয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা সফলতা অর্জনের মনোভাব জাগ্রত হয় [১]। এই সমস্ত সাধনের কয়েকটির আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

~~~~~~

১। শেষ সাধন সকলের পক্ষে আবশ্যক, ইহা শারীরিক উন্নতি লাভের আশায় হোক অথবা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার উন্নতির আশায় হোক।
~~~~~~

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণায়ামের মূল সিদ্ধান্ত

মুনি পতঞ্জলি যোগদর্শনের যম, নিয়ম ও আসন সিদ্ধ হইলে প্রাণায়ামের অভ্যাস করবার বিধান দিয়েছেন। এই তিন প্রকার অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা একদিকে যেমন শারীরিক উন্নতি হয়, অপরদিকে যম, নিয়ম ও আসন দ্বারাও মানসিক উন্নতি হয়, এ বিষয়ে কারো মতভেদ নাই। কিন্তু আসনের অভ্যাস দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধন কিরূপে হয়, এ বিষয়ে কারও কারও মনে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যোগদর্শনে কিন্তু স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসন সিদ্ধ দ্বারা মানুষের দ্বন্দ্ব (শীত গ্রীষ্ম) সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে।[১] এবার আসন সিদ্ধির পর প্রাণায়াম অভ্যাস আরম্ভ করা হইতেছে।

প্রাণায়ামের পরিচয়

শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিকে রুদ্ধ করার নাম **'প্রাণায়াম'।** নাসিকা দ্বারা বাহিরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করানোকে – **'শ্বাস'** এবং নাসিকা দ্বারা ভিতরের প্রবষ্টি বায়ুকে বাহিরে ফেলার নাম – **'প্রশ্বাস'**। [২]

ইহাদের গতি রুদ্ধ করার উদ্দেশ্য — শ্বাসকে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিতরেই রুদ্ধ করা। এইভাবে অভ্যন্তরস্থিত বায়ুকে বাহিরে ফেলে বাহিরেই রুদ্ধ করবে।

~~~~~~

১। ততোদ্বন্দ্বাঽনভিঘাতঃ॥ [যোগদর্শন ২/৪৮] অর্থাৎ, ঐ সমস্ত আসন সিদ্ধির দ্বারা দ্বন্দ্বের আঘাত লাগে না।

২। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥ [যোগ ২/৪৯] অর্থাৎ, ঐ আসন সিদ্ধ হইলে শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিকে রুদ্ধ করার নাম প্রাণায়াম।
~~~~~~

'প্রাণায়াম' শব্দ দুইটি শব্দের যোগে সৃষ্ট। **'প্রাণ+য়াম'**, শ্বাস ও প্রশ্বাসের নাম **'প্রাণ'**, এবং ছড়ানো বা বিস্তৃতি করিবার নাম **'যাম'**। এই প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণকে বিস্তৃত করা Expanding of Breathing, এই কারণে প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের বিস্তৃতি অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিগ্রহ করে স্ববশে এনে তাকে রুদ্ধ করার অবধিকে বা সীমাকে বিস্তৃত করা।

প্রাণায়ামের প্রকার

প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া করা হয়। **রেচক**, **পূরক**, ও **স্তম্ভবৃত্তি**।

১। প্রাণকে বাহিরে বর্জন করা, একে **'রেচক'** বলে।

২। প্রাণকে ভিতরে গ্রহণ করা, একে **'পূরক'** বলে।

৩। প্রাণ যেখানে আছে সেখানেই রুদ্ধ করাকে **'স্তম্ভবৃত্তি'** বলে।

এই প্রাণায়াম — দেশ কাল ও সংখ্যা ভেদে তিন প্রকার। [১]

১। 'দেশ' পরিদৃষ্ট। স্বল্প দূর, অধিক দূর অথবা অত্যন্ত অধিক দূরের প্রাণ টেনে আনা বা পূর্ণ করা।

২। 'কাল' পরিদৃষ্ট। এক দুই অথবা অধিকক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ সমূহকে বাহিরে ফেলা, ভিতরে টেনে আনা ও স্থির করা।

৩। 'সংখ্যা' পরিদৃষ্ট। এক দুই বা অধিক বার প্রাণ সমূহকে বাহিরে ফেলে ভিতরে পূর্ণ করা এবং স্থির রাখা।

~~~~~~

১। বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভি পরিদৃষ্টা দীর্ঘসূক্ষ্ম ॥ [যোগদর্শন ২/৫০]

অর্থাৎ, অর্থাৎ (১) বাহ্য, (২) আভ্যন্তর, (৩) স্তম্ভবৃত্তি ভেদে তিন প্রকারের প্রাণায়াম। দেশ কাল ও সংখ্যা দ্বারা দৃষ্ট ও দীর্ঘ সূক্ষ্ম হয়।
~~~~~~

৪। প্রাণায়ামের চতুর্থ ক্রিয়া কুম্ভক।[১] এই কুম্ভকে এবং স্তম্ভবৃত্তি নামক প্রাণায়ামের পার্থক্য এই যে, স্তম্ভবৃত্তিকে প্রাণকে বাহিরে ও ভিতরে না ফেলা এবং না টানা অবস্থায় রুদ্ধ করা, কিন্তু কুম্ভক প্রাণকে বাহিরে ভিতরে টেনে এনে রুদ্ধ করা হয়।

ইহাই প্রাণায়ামের মূল সিদ্ধান্ত (মূল ক্রিয়া) এবং এই সমস্তের উপর ভিত্তি করে প্রাণায়ামের অনেক বিভাগ করা হয়েছে। উপযোগিতার দৃষ্টিতে এই সব বিভক্ত প্রাণায়াম সমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ঋষিদের ইহা একটি অপূর্ব প্রকাশ ভঙ্গিমার ফল এই যে, তিনটি সূত্রে প্রাণায়ামের সমস্ত ক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বিদ্যার প্রচার না থাকায় দেশবাসী এই বিষয়ে এরূপ যোগ্যতাহীন হয়ে পড়েছে যে, তাঁরা সূত্রকে সামনে রেখে অভ্যাস করতেও অক্ষম। তা না হলে এই সমস্ত পৃষ্ঠা লিখে পূর্ণ করার প্রয়োজন কি ?

ইহার পর বলা হবে যে, কিভাবে একজন নবীন অভ্যাসীর প্রাণায়াম আরম্ভ করা প্রয়োজন। ইহার পূর্বে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন যে, মানসিক উন্নতির তুষ্টিতে প্রাণায়াম করা কেন প্রয়োজন ?

প্রাণায়ামের ফল

প্রাণায়ামের ফল এই যে, ইহার অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে সঞ্চিত তম আবরণ নষ্ট হয়ে যায়।[২] হৃদয়ে শুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চিত হয় এবং জ্ঞান সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যখন মানুষ এরূপ কর্ম করতে থাকে, যা কাম ক্রোধ ও মোহ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাকে তমোগুণের পরিণাম বলা

~~~~~~

১। ব্যহ্যাভ্যন্তরবিষয়ক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ [যোগদর্শন ২/৫১]

অর্থাৎ, বাহ্য এং আভ্যন্তর = ভিতর, উভয় দেশে অপেক্ষাকারী চতুর্থ প্রাণায়াম অর্থাৎ যাকে এ দুই প্রাণায়ামের (রেচক, পুরক) পরিত্যক্ত হয় তাই চতুর্থ প্রাণায়াম।

২। ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ [যোগদর্শন ২/৫২]

অর্থাৎ, উহা (প্রাণায়াম সাধন) দ্বারা প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়।
~~~~~~

হয়, ঐ সমস্ত কর্ম দ্বারা হৃদয়স্থিত শুদ্ধ জ্ঞানরূপী প্রকাশের আবরণ স্বরূপ হয়ে শুদ্ধ জ্ঞানকে ঢেকে ফেলে। এই যে আবৃত জ্ঞান, একে কিভাবে 'তম আবরণ' হতে মুক্ত করা যায় ? ইহার একমাত্র উপায় প্রাণায়াম অভ্যাস। প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারাই অজ্ঞানতা বা 'তম আবরণ' জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা উত্তরোত্তর নাশ হতে থাকে এবং জ্ঞানের প্রকাশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১] যেরূপ সুবর্ণাদি ধাতুকে দহন করলে তাদের মল নষ্ট হয় তদ্রূপ তমোগুণ নাশ হয়ে শুদ্ধজ্ঞান প্রকাশ হয়ে পড়ে।[২]

প্রাণায়ামের আর একটি ফল

প্রাণায়ামের আর একটি ফল, ইহার অভ্যাস দ্বারা মানুষের ধারণার (চিত্তের একাগ্রতার) যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে বিদ্যার্থী নিজের পাঠ অতি সহজে বুঝতে ও মুখস্থ করতে পারে। ইহার অভ্যাস দ্বারা একটি বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের পরীক্ষা করতে সমর্থ হয়। এক দার্শনিক পরীক্ষার বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করে অধ্যাত্ম জগতে প্রগতি লাভ করতে পারে। এক সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ আপন উদ্যমের গূঢ় অপেক্ষা গূঢ় বিষয়ে প্রবেশ করে তার উপায় খুঁজে বের করতে পারে। মোট কথা ইহলোক ও পরলোক বিষয়ক ব্যাপার সবই চিত্তের একতা বা একাগ্রতা প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারাই লাভ করতে পারে।

প্রাণায়ামের অনেক ফল এবং অনেক লাভ। কিন্তু ঐ সমস্তকে যদি মূল রূপে বলা যায় তাহলে তার বর্ণনা উপরোক্ত দুইটি ফলের রূপেই পাওয়া যাবে। এবার আমরা প্রতিজ্ঞানুসারে তার বিধি বর্ণনা করতেছি, যাতে নবীন শিক্ষার্থী প্রাণায়াম অভ্যাসে আগ্রহশীল হয়।

~~~~~~

১। যোগাঙ্গানুষ্টানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ [যোগদর্শন ২/২৮] অর্থাৎ, অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় এবং অশুদ্ধি ক্ষয়ে বিবেকখ্যাতি (তত্ত্বজ্ঞান) পর্যন্ত জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

২। দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ। তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোয়াঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥ [মুন ৬/৭১] অর্থাৎ, সুবর্ণাদি ধাতুকে অগ্নিতে দহন করিলে যেরূপ তাদের মল নষ্ট হয়ে শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ দূর হয়।
~~~~~~

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, প্রাণায়াম অনেক প্রকারে, অনেক প্রকার কার্য সিদ্ধির জন্য করা হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমস্ত প্রাণায়ামের বিষয় বলব যদ্বারা সেই সমস্ত প্রাণায়ামের অভ্যাস করার রীতি সাধারণত সকলের পক্ষেই উপযোগী হবে।

সেরূপ প্রাণায়ামের কথাই বলা হবে, যা যোগ সাধনের দৃষ্টিতে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হবার পরেও করা যেতে পারে।

প্রথম প্রাণায়াম

পদ্মাসন অথবা অপর কোনো আসন, যাতে সুখপূর্বক যত সময় প্রাণায়াম করার ইচ্ছা তত সময় আসন পরিবর্তন না করে বসে থাকা যায়।

১। বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক তিনটিকেই সরল ভাবে রাখিবে, এবং ধীরে ধীরে নাসারন্ধ্র পথে প্রশ্বাস বাহিরে ফেলবে (**রেচক**) এবং প্রশ্বাসকে বাহিরেই রুদ্ধ করে রাখবে (**বাহ্য কুম্ভক**)।

২। যখন অধিক সময় পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ না করে থাকা অসম্ভব মনে করবে তখন ধীরে ধীরে **'পুরক'** শ্বাসকে ভিতরে গ্রহণ করে অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে ভিতরেই রুদ্ধ করে রাখবে (অভ্যন্তর) কুম্ভক)।

৩। যখন অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে ভিতরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না দেখবে, তখন ধীরে ধীরে আবার **'রেচক'** করিবে।

৪। এই ভাবে অনেকবার অভ্যাস করো, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার সাথে সাত মহা ব্যাহৃতি মনে মনে জপ করিতে থাকো। জিহ্বার দ্বারা ব্যাহৃতি উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই।

***বি.দ্রঃ** এই প্রাণায়াম দ্বারা রেচক, পূরক ও কুম্ভক অর্থাৎ মানুষের মধ্যে প্রাণায়াম, এবং তা প্রত্যেকটি ক্রিয়া করার অভ্যাস হয় তথা ভবিষ্যতে প্রাণায়াম করার শক্তি জেগে ওঠে। এই প্রাণায়ামের অভ্যাস সেই পরিমাণ করা উচিত, যাতে শ্বাসকে ভিতরে দুই মিনিট কাল ধরে রাখতে পারা যায়। অধিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে পারলে অধিক লাভ। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, যত সময় শ্বাসকে ভিতরে অক্লেশে রাখা যায় তত সময় রাখবে; চিত্তকে পরাধীন করবেন না। অভ্যাস দ্বারাই ধীরে ধীরে বাহির ভিতর উভয় দিকে শ্বাসরুদ্ধ করার শক্তি আপনা-আপনি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।*

☆ *সাতটি মহা ব্যাহৃতি হলোঃ* ***ওওম্ ভূঃ, ওওম্ ভুবঃ, ওওম্ স্বঃ, ওওম্ মহঃ, ওওম্ জনঃ, ওওম্ তপঃ, ওওম্ সত্যম্ ॥***

দ্বিতীয় প্রাণায়াম

(ফুসফুসের সমস্ত কোষে বায়ু প্রবেশ করানো)

১। শান্ত হয়ে পদ্মাসন অথবা অপর কোনো আসনে, যাতে সুখপূর্বক শেষ পর্যন্ত বসা যায় সেই আসনে বসবে, এবং নাসিকা হতে ধীরে ধীরে শ্বাস দ্বারা শুদ্ধ বায়ু ভিতরের দিকে টানতে থাকবে। প্রথমে ফুসফুসের নীচের দিক পুর্ণ করো এবং প্রবল ইচ্ছা রাখো যে, ফুসফুসের নীচের দিক বায়ু দ্বারা ভর্তি হচ্ছে। এরূপ করলে পেট কিছুটা ফুলে যাবে।

এরপর সেই শ্বাস দ্বারাই ফুসফুসের মধ্যভাগে বায়ু পৌঁছিয়ে দাও। এই ক্রিয়া এবং পূর্বের ক্রিয়ার সহিত ইচ্ছা শক্তিকে যুক্ত করতে থাকো। এই ক্রিয়ার দ্বারা পেটে একটু সংকোচন হয়ে যাবে (চুপসে যাবে) এবং বক্ষের উপরিভাগ কিছুটা উন্নত হয়ে ভরে উঠবে।

এরপর শ্বাসের তৃতীয় ও অন্তিম ভাগ হতে ফুসফুসের উপর অংশ ভরে তোলো। এই ক্রিয়া প্রারম্ভ করার পূর্বে দুই স্কন্ধকে একটু উপরে উঠাও। এই তিনটি ক্রিয়ার দ্বারা পূর্ণ করা হলো। ইহাকে সম্পূর্ণ করতে মোটামুটি অর্ধ মিনিট ব্যয় করতে হবে।

২। এরপর কুম্ভক করবে। এক মিনিট অপেক্ষা কিছু অধিক অথবা কমপক্ষে এক মিনিট বায়ুকে ভিতরে রুদ্ধ করে রাখবে।

বি.দ্রঃ *অভ্যাস করার সময় কতগুলি প্রাণায়াম এক সঙ্গে করতে হবে পরন্তু নিরন্তর বিরাম না দিয়া করবে না। এক প্রাণায়ামের পর দুই, চার বার শ্বাস গ্রহণ করে আবার দ্বিতীয় প্রাণায়াম। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি করতে থাকবে। ইহার সহিত এই ইচ্ছা মনে করতে থাকবে ফুসফুসের সমস্ত কোষ যেন বায়ু দ্বার পূর্ণ হচ্ছে ।*

✰ পুনরায় 'রেচক' করে বায়ুকে বাহিরে নিক্ষেপ করো।

তৃতীয় প্রাণায়াম
(সুখদ প্রাণায়াম)

প্রাণায়াম অভ্যাস কালে ক্লান্তি হয়। ক্লান্তি দূর করার জন্য সুখদ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। এই জন্য এর নাম সুখদ প্রাণায়াম।

১। প্রাণায়ামের সংখ্যা অনুসারে পূর্ণ করবে।

২। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা শক্তিকে যুক্ত করে কুম্ভক করবে।

৩। রেচক মুখের সাহায্যে করবে। মুখের সাহায্যে রেচক করার সময় মুখের স্থিতি এবং আকৃতি এরূপ করবে যেরূপ মুখ দিয়া সিটি বাজানোর সময় হয়ে থাকে এবং বেগে তিন অপেক্ষা অধিক বার বাহিরে স্বল্প স্বল্প শ্বাস বাহিরে ফেলবে। একবার ফেলবার পর কিছু সময় থেমে, একইভাবে পুনরায় ফেলবে এবং ফেলার পর কিছু সময় থেমে প্রত্যেকবার বলপূর্বক বাহিরে শ্বাস ফেলবে।

বি.দ্রঃ *কোনো প্রকার বা যেকোন প্রকারের প্রাণায়াম অভ্যাস কর না কেন, শেষে* ***সুখদ প্রাণায়াম*** *অবশ্যই করবে। ইহার দ্বারা সুস্থাভাব ফিরে আসে এবং সর্বপ্রকার অশান্তি দূর হয়।*

চতুর্থ প্রাণায়াম
(ফুসফুস ব্যতীত পেট এবং অন্ত্রেও বায়ু পূর্ণ করা)

১। বাম পা দক্ষিণ জঙ্ঘার উপর স্থাপন করো। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশকে সোজা সমান ভাবে রাখো। দুই হাতের করতল হাঁটুর উপর রেখে মুখ বন্ধ করে বসো।

২। নাসিকার দুইটিছিদ্র হতে ধীরে-ধীরে অথচ শীঘ্র **'পূরক'** করো এবং **'কুম্ভক'** ছাড়াই **'রেচক'** করো।

৩। এই অভ্যাস নিরন্তর করে যাও, যত সময় না পরিশ্রান্ত হও এবং ঘাম না ঝরে তত সময় করে যাও।

৪। অভ্যাস কালে দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে স্থির রাখবে।

৫। পরিশ্রান্ত হইলে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা **'পূরক'** করে **'কুম্ভক'** করবে এবং ফুসফুসকে বায়ু দ্বারা খুব পরিপূর্ণ করে ফেলবে এরপর, বাম নাসারন্ধ দ্বারা **'রেচক'** করে অভ্যাস শেষ করবে।

মন্তব্য ১ — এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যত সময় না ভুক্ত দ্রব্যের প্রতিটি কণা (Oxygen) অক্সিজেনের ভিতরে প্রবেশ করে, তত সময় ভোজন পরিপাক হয় না। এইজন্য আগ্নাশয় এবং অন্ত্রেও প্রচুর মাত্রায় বায়ু থাকা উচিত।

মন্তব্য ২ — এই প্রাণায়ামের অভ্যাস হয়ে গেলে এর অনুষ্ঠানে সাধারণ জ্বর দূর করা যায়। আর যদি সময়ে ভোজন না পাওয়া যায়, তাহলে এই প্রাণায়াম অভুক্ত অবস্থায় করলেও কিছু সময় মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট হতে রক্ষা পেতে পারে।

পঞ্চম প্রাণায়াম
(সমস্ত শরীরকে সুস্থ রাখতে)

১। বাম জঙ্ঘার উপর দক্ষিণ পা এবং দক্ষিণ জঙ্ঘার উপর বাম পা রাখো দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিছন দিক হতে ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে এবং এই ভাবে বা হাত দ্বারা বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরবে। যদি দেহ নমনশীল ও হাল্কা না হয় তাহলে অঙ্গুষ্ঠকে হস্ত দ্বারা ধরতে পারা সম্ভব নাও হতে পারে এমতাবস্থায় ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে করতে শরীরকে খুব

শক্ত করে ও সরল বা ঋজু অবস্থায় রাখবে।

২। প্রাণায়াম, সংখ্যা (১) এর ন্যায় **'পূরক' 'কুম্ভক'** ও **'রেচক'** করো।

৩। যত সময় না দেহে রোমাঞ্চ হচ্ছে মনে হয়, তত সময় অভ্যাস করতে থাকো।

ষষ্ঠ প্রাণায়াম

(শক্তিলাভ করার ও শক্তিস্থির রাখার জন্য)

১। পদ্মাসনে উপবেশন করো।

২। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা পূরক' করো।

৩। নিজের চিবুককে বুকের উপর রেখে, সরল হস্ত দ্বারা বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরো, এবং মাথাটিকে দক্ষিণ অথবা বাম যে কোনো হাঁটুর সহিত ঠেকিয়ে 'কুম্ভক' করো।

৪। বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা 'রেচক' করো।

৫। দ্বিতীয় প্রাণায়ামের সময় বাম নাসারক্ত দ্বারা 'পূরক' এবং দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা 'রেচক' করা উচিত।

৬। এই অভ্যাস ক্রমশ বৃদ্ধি করে এক ঘন্টা কাল পর্যন্ত করা উচিত।

সপ্তম প্রাণায়াম

রক্ত সঞ্চারক ক্রিয়াকে নিয়মিত করতে এবং বিচার শক্তির বৃদ্ধির জন্য নিম্ন প্রকার প্রাণায়াম করা উচিত।

১। পদ্মাসনে উপবেশন করো। দক্ষিণ হাত দ্বারা দক্ষিণ পায়ের এবং বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরো।

২। বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা 'পুরক করো।

৩। আবার 'কুম্ভক' করো।

৪। পুনরায় দক্ষিণ নাসার দ্বারা 'পূরক' এবং বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা ধীরে 'রেচক' করো। বাম নাসারক্ত দিয়া 'রেচক' করা উচিত। এইভাবে পূর্ব অভ্যাস মত প্রত্যেক প্রাণায়ামের সহিত 'রেচক' ও 'পূরক' প্রাণায়ামের ক্রম পরিবর্তন করতে থাকবে।

৫। দম বের হতে থাকলে এই অভ্যাস স্থক্ষিণ রাখা উচিত।

অষ্টম প্রাণায়াম

১। বাম পায়ের গোড়ালি মুলেন্দ্রিয়ে এবং দক্ষিণ পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের জঙ্ঘায় রাখো এবং চিবুককে বুকে লাগিয়ে চোখ বন্ধ রাখো।

২। গভীর এবং দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে 'রেচক' করো।

৩। পুনরায় 'কুম্ভক' এবং তারপর 'রেচক' করো।

৪। এই অভ্যাস বৃদ্ধি করতে এক ঘন্টা পর্যন্ত সময় নিযুক্ত করা আবশ্যক।

নবম প্রাণায়াম
(শীত ত্রাণার্থ)

১। বাম পদ মূলেন্দ্রিয়ের নীচে রাখো এবং চিবুককে বুকে। হাত দুইটিকে প্রসারিত করে লম্বমান সরলভাবে স্থিত দক্ষিণ পদকে ধরো, এবং মাথাটিকে দক্ষিণ হাঁটুর সহিত লাগিয়ে দাও।

২। বাম নাসারক্ত দ্বারা প্রাণায়াম সংখ্যা (২) এর ন্যায় 'পূরক' করে ফুসফুসকে বায়ু দ্বারা পূর্ণ করে দাও।

৩। দৃষ্টিকে নাসিকার অগ্রভাগে স্থির করে 'কুম্ভক' করো।

৪। পুনরায় দক্ষিণ নাসারন্দ্র দ্বারা 'রেচক' করো।

৫। ইহাকে ঘন্টাকাল এইরূপ অভ্যাস করলে ঘাম ঝরিতে থাকিবে এবং রক্তের গতি ও বৃদ্ধি

পাবে। ঘাম ঝরতে থাকলে অভ্যাস বন্ধ করা উচিত।

দশম প্রাণায়াম

(আমাশয়ের [সাধারণ] রোগ নিবৃত্তির জন্য)

১। যুক্ত-জানু হয়ে উপবেশন করো, করতল বিস্তৃত করে জঙ্ঘার উপর স্থাপন করো অথবা অনুরূপ করতল পৃষ্ঠদেশে রাখো।

২। প্রথম 'পূরক' তারপর 'কুম্ভক', তারপর 'রেচক' করো।

৩। এই অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে একঘন্টা পর্যন্ত চালাও।

একাদশ প্রাণায়াম

(দন্তরোগ দূরীকরণার্থে এবং শারীরিক পুষ্টির জন্য)

১। বাম পা দক্ষিণ জঙ্ঘার এবং দক্ষিণ পা বাম জঙ্ঘায় স্থাপন করো এবং দক্ষিণ হাত দিয়ে দক্ষিণা পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে এবং বাম হাত দিয়ে, বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরো।

২। মুখ দিয়ে এভাবে পূরক করবে যেন, দন্ত পংক্তি ও শ্বাস গ্রহণে সহায়ক হয় এবং 'সী', শব্দের ন্যায় ধ্বনি হতে থাকে।

৩। 'কুম্ভক' করে নাসারন্ধ্র পথে ধীরে ধীরে 'রেচক' করবে।

৪। এইভারে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস বৃদ্ধি করা উচিত।

দ্বাদশ প্রাণায়াম

(শরীরের উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য)

১। সিদ্ধাসন হয়ে বসবে। দুই নাসারন্ধ্র পথে প্রথমে ধীরে ধীরে 'পূরক' করে পরে 'রেচক' করবে।

২। পুনরায় 'পূরক', পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুত করে আবার 'রেচক'।

৩। এইভাবে পূরকের বেগ ধীরে ধীরে দ্রুতবৃদ্ধি করতে থাকবে যাতে বাস লৌহকারের হাপরের ন্যায় চলতে থাকে।

৪। ঘাম দেখা দিলে অভ্যাস স্থগিত রাখবে।

বি.দ্রঃ *এই প্রাণায়ামের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা শরীরের গাঁয়ের বেদনা এবং পায়ের পেটের বেদনা দূর হতে থাকে, পরন্তু অভ্যাস ধীরে ধীরে একঘন্ট কাল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।*

ত্রয়োদশ প্রাণায়াম

জিহ্বা, তালু, নাসিকা, কর্ণ এবং গলা, কণ্ঠ ও গ্রীবাকে নীরেগ রাখিতে হলে এই প্রাণায়াম করা উচিত —

১। শান্ত চিত্তে পদ্মাসনে বসবে।

২। জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সহিত স্পর্শ করাও। তারপর মুখ দ্বারা 'পূরক' করো।

৩। সমস্ত শরীরকে শিথিল করে 'কুম্ভক' করো।

৪। নাসিকা দ্বারা 'রেচক' করো।

৫। অভ্যাস দ্বারা এই প্রক্রিয়া ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বৃদ্ধি করো।

চতুর্দশ প্রাণায়াম
(ব্রহ্মচর্যের সাধক)

১। চিৎ হয়ে শয়ন করো, কান দুটিকে তুলার নুটি অথবা মোম দিয়ে প্রসারিত বন্ধ করে দাও, যাতে কোনও প্রকার শব্দ শুনতে না পাওয়া যায়। এবার নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করো।

২। অর্ধঘন্টাকাল এই অবস্থায় থাকবে। থেমে দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করতে থাকো।

৩। এবার চোখের পুতলি দুটিকে উপরে উঠাও এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দুটি স্থাপন করো। এইরূপ করলে চক্ষু দুইটি বন্ধ হতে থাকিবে, উহাকে বন্ধ থাকতে দাও।

দ্রষ্টব্যঃ — (১) এই ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা 'কুম্ভক' করার শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে চিত্তে একাগ্রতা জন্মে এবং ইন্দ্রিয় সংযত হয়।

(২) উক্ত ২ এর সংখ্যার স্থিতিতে অধিক সময় থাকলে ভিতরে শব্দ শোনা যায়। যাকে কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, **'অনহদ'** নাদ বা শব্দ আখা দিয়েছেন।

পঞ্চদশ প্রাণয়াম
(বীর্যস্তম্ভক প্রাণায়াম)

১। বাম পদের গোড়ালীটিকে মলেন্দ্রিয়ের নীচে এবং দক্ষিণ পা খানি বাম পায়ের জঙ্ঘার উপর স্থাপন করো।

২। নাভি দেশে ধারণ করে নাসিকার যে কোনো ছিদ্র পথে 'পূরক' করো।

৩। পুনরায় 'কুম্ভক' করে অপর ছিদ্ররের পথে রেচক করো।

৪। এই ভাবে চতুর্দশ বার অভ্যাস করো।

৫। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে ছিদ্র পথে 'পূরক' ও 'চেরক' করা হয়েছিল এক সময়ের অভ্যাস, ঠিক সেই সেই ছিদ্র পথে 'পূরক' ও 'রেচক করা উচিত।

দ্রষ্টব্য — (১) প্রাণায়াম আরম্ভকালে সব প্রথম 'যম' ও 'নিয়ম' ভালোভাবে বুঝে চিন্তন করতে থাকবে, যেন বীর্যের ঊর্ধ্ব গতি লাভ হচ্ছে।

(২) প্রাণায়ামের প্রত্যেকটি ক্রিয়া সাধিবার সময় মনে এরূপ প্রবল ভাব জাগ্রত করতে থাকবে, যেন বীর্যের ঊর্ধ্বগতি লাভ হচ্ছে।

(৩) গৃহস্থ পুরুঙ্গের পক্ষে স্ত্রীর গর্ভস্থিতি হইলে এই প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা লাভবান হতে পারা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাণায়ামের উপযোগী সাধনের স্পষ্টীকরণ

বিষয় শেষ করার পূর্বে প্রথমে ইহা বলা প্রয়োজন যে, প্রাণায়ামের আটটি উপযোগী সাধনের মধ্যে যা প্রথম অভ্যাসের শেষে লিখিত হয়েছে তাহার স্পষ্টীকরণ এরূপভাবে করা উচিত যাতে তাদের উপযোগিতা পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তৃতীয় সাধনের স্পষ্টীকরণ

তৃতীয় সাধনটি এই যে, নাসিকা দ্বারা শ্বাস নেওয়ার অভ্যাস করা উচিত। কেননা, নাসিকা পথে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা, প্রকৃতি জাত নাসিকা শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র, মুখ শ্বাস নেওয়ার যন্ত্র নয়। যে যে ইন্দ্রিয় যে যে কর্মের জন্য নিযুক্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই কর্ম যথারীতি সম্পন্ন করা উচিত। ইহাই ঈশ্বরীয় নিয়ম। এবার জানা উচিত যে, নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করার ব্যবস্থা কেন রাখা হয়েছে ?

১। প্রথমত – মোটামুটি কথা এই যে, নাসিকা তার অনুপযোগী বস্তু ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না।

২। দ্বিতীয়ত – যদি কোনও অনুপযোগী কণা নাসিকার লোমা উল্লঙ্ঘন করে ভিতরে প্রবেশ করে, তাহলে নাসিকা সে বস্তুটিকে হেঁচে বের করে দেয়।

৩। তৃতীয়ত – ফুসফুসের কোষগুলো অত্যন্ত কোমল বলে যে বায়ুটি সেখানে পৌঁছে তার উষ্ণতা Temparecture এরূপ হওয়া উচিত, যাতে সে তা সহ্য করতে পারে। এই কারণে নাসিকার এরূপ ব্যবস্থা আছে। বায়ু শ্বাস দ্বারা যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নাকের ভিতরে ঝিল্লির (Macus membrane) সম্পর্কে সে গ্রহণের অনুকূল শীতোষ্ণ (Temperature) হয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, এইভাবে ফুসফুসের কোমল কোশ সমূহের কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। কিন্তু মুখে এ সমস্ত ব্যবস্থা নাই। এই কারণ নাসিকা পথেই শ্বাস করা উচিত।

পঞ্চম সাধনের স্পষ্টীকরণ

পঞ্চম সাধন এই যে, নিদ্রা কালেও মুখ না ঢেকে নিদ্রা যাওয়া উচিত। মুখ ঢেকে নিদ্রা যাওয়ার বদ্-অভ্যাস দ্বারা শ্বাসের সহিত সেই দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু, প্রশ্বাস দ্বারা বিষাক্ত হয়ে যে বায়ু বের হয়েছিল তা পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করে এবং এইভাবে বারংবার যাওয়া আসা করে। পরিণাম স্বরূপ এই অশুদ্ধ বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কার না হয়ে বিষাক্তই থেকে যায়। অতএব সুস্থ ও নীরোগ থাকতে হলে স্ত্রী হোক, আর পুরুষ হোক বা বালক ও বালিকা সকলেরই মুখ না ঢেকে নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস করা উচিত।

সপ্তম সাধনের স্পষ্টীকরণ

সপ্তম সাধন ভোজন। ভোজন ততটুক করা প্রয়োজন যতটুকু ভোজন করলে অজীর্ণ বা অম্ল না হয়। অত্যধিক ভোজন বর্জনীয়। প্রায় দেখা যায়, ভোজন বিষয়ে মানুষ বড়ই অসংযমী ও অসাবধান। পরিণাম স্বরূপ দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে, স্বল্পায়ুও হয়। ভোজনের সংশোধনও প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে কিছু নিয়ম পালন করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

১। ভোজন যথ্য সময় অর্থাৎ নিশ্চিত সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে ভোজন করবে।

২। ভোজন করার পর তিন ঘণ্টার মধ্যে স্বল্প মাত্রাও আহার করা উচিত নয়।

৩। প্রসন্ন হয়ে ভোজন করবে, অপ্রসন্ন হয়ে ভোজন করবে না। কেউ কেউ অন্নের নিন্দা করে থাকে এবং ভোজ্যের ত্রুটি বিচ্যুতি বের করে। শুধু তাই নয়, অনেকে অপ্রসন্ন হয়েও ভোজন করে। এরূপ ভোজনকারীর ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয় না।

৪। খাদ্য খুব চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। দুই প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন — (১) এক প্রকার প্রাণী যাদের দাঁত আছে, (২) আর এক প্রকার যাদের দাঁত নাই, যথা: পক্ষী। এদের পেটে এক প্রকারের 'পাথরী' (Gizzard) দেওয়া আছে, যার সাহায্যে তারা দাঁতের ন্যায় ভোজনকে পেষণ করতে পারে।

মানুষের দাঁত আছে, তা তাদের 'আগ্নাশয়ে' উপযুক্ত পাথর দেওয়া হয় নাই। এই কারণে মানুষকে দাঁতের সাহায্যে ভোজ্য বস্তু খুব চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। যাতে ভুক্ত দ্রব্য এরূপ সূক্ষ্ম হইয়া যায়, যেন মুখ হতে নির্গত লালা Saliva ভালভাবে চর্বিত খাদ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়।

মুখের ভিতরে ছয়টি গ্রন্থি আছে। (Salivary Glands) তাদের চারটি, জিহ্বা ও মাড়ির নীচে; আর দুইটি আছে গলার দুই দিকে। মানুষ যখন আহার করে, তখন ঐ গ্রন্থিসমূহ হতে ক্লোমরস নিঃসরণ হতে থাকে এবং ঐ লালা বা ক্লোমরস খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হতে থাকে। খাদ্য দ্রবকে চিবিয়ে যত সূক্ষ্ম করা হবে নিসৃত ক্লোমরস ততই চর্বিত খাদ্যের সহিত মিশে যাবে। ইহাতে পরিপাক ক্রিয়া সহজ হবে।

যে ব্যক্তি খাদ্য বস্তুকে দাঁত দিয়ে অধিক না চিবিয়ে অর্ধ-চর্বিত অবস্থায় গিলে খায়, তাদের অর্ধ-চর্বিত খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লোমরস মিশ্রিত না হওয়ায় পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে।

সুতরাং ভোজন বিষয়ে প্রথম কাজ হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রবাকে চিবিয়ে তাকে মিষ্ট রসে পরিণত করা। ইহা গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস দ্বারাই হতে পারে। যত সময় পর্যন্ত আগ্নাশয়ে চর্বিত খাদ্য না পৌঁছয়, তত সময় চর্বণ ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখা প্রয়োজন।

যখন চর্বিত খাদ্য দ্রব্য আগ্নাশয়ে মিষ্ট রূরে পরিবর্তিত হয়ে পৌঁছয় তখন হতেই আগ্নাশয়ের সূক্ষ্ম নালি হতে (Gastric juice) পাচক রস নির্গত হয়ে মিশ্রিত হয় এবং এই পাচক রসে আরও একটি সূক্ষ্ম পরিপাচক দ্রব্য থাকে তাহার নাম (Pepsin)। এই (Pepsin juice) রস এবং পাচা দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হলেই ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়। পরন্তু এই পাচক রস ও পাচ্য দ্রব্য, ভুক্ত পদার্থের সহিত তখনই মিশ্রিত হয়, যখন ভোজন শর্করায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। যদি ভেজা শর্করায় পরিবতিত না হয়ে ভুক্ত দ্রব্য আগ্নাশয়ে পৌঁছিয় তখন তা পরিপাকের পরিবর্তে পচন আরম্ভ করে এবং সেই পচা ভুক্ত ভোজন ধীরে ধীরে অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তাতে এরূপ দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে যে, পচা গলা বস্তুতে সৃষ্ট পোকার ন্যায় অন্ত্রেও ক্রিমি সৃষ্টি হয়ে

মানুষকে রোগী করে তোলে।

অপরদিকে আগ্নাশয়ে পচা ভুক্ত ভোজনের অবশিষ্ট অংশ থেকে যায় এবং তার ক্রমাগত ভোজনের সহিত মিশ্রিত হয়ে তাকে বিষ্যক্ত করে তোলো। এইরূপে স্থায়ী অজীর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত শরীরকে বিষাক্ত ভোজন জনিত দোষে দেহের রক্তে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে। এই সমস্ত ভয়ানক পরিণাম কেবল খাদ্যকে ভালোভাবে চিবিয়ে না খাওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। শুধু তাই নহে, ভুক্ত দ্রব্যকে লালা দ্বারা মিশ্রিত করে না খাওয়ার দুষ্পরিণাম ভোগ করতে হয়। অতএব ভোজন খুব চিবিয়ে অবশ্যই করা উচিত।

ভেবে দেখুন, যেখন ভোজনের দুষ্পরিণামে শরীর এরূপ রোগগ্রস্ত হয়ে যায়, সে অবস্থায় বিষাক্ত রক্ত শরীরে রেখে শরীরকে রোগী করে প্রাণায়াম করার প্রয়াস নিরর্থক নয় কি ?

অতএব প্রাণায়ামের উপযোগী যে সমস্ত সাধন বলা হয়েছে, সেগুলিকে যথাযথ রূপে কার্যোপযোগী করা আবশ্যক। যাঁরা প্রাণায়াম করেন এবং যাঁহারা করেন না তাঁদের সকলের বর্ণিত নিয়ম পালন করা কর্তব।

প্রাণায়াম

বিষয় বিকার হতে উৎপন্ন মলিনতা পরিমার্জনার্থে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ এবং অন্তঃকরণে আবৃত বিষয় ধূলিকে ঝোড়ে পবিত্র করার জন্য প্রাণায়াম এক সার্থক মার্জন সাধনা। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের মলিনতা, বিক্ষেপ তথা আবরণকে নষ্ট করার জন্য মুনস্মৃতি, তথা যোগদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ প্রাণায়ামকে প্রমুখ সাধন স্বীকার করেছেন। বিধিবৎ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারাই মানুষ মল রহিত হয় এবং দিব্য ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারাই বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করে।

–: সম্পূর্ণ:–

ভেক ও প্রাণায়াম

কতিপয় প্রাণীর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যাদের এক মিনিটে নিম্ন প্রকার সংখ্যায় শ্বাস গ্রহণ করে।

কপোত-৩৪। সাধারণ পক্ষী-৩০। হংস-২১। বানর-৩০। মনুষ্য-৭২। বরাহ-৩৬। কুকুর-২৮। মার্জার-২৪। অজ-২৪। অশ্ব-১৬। ভেক-৩।

এই হিসাবে দেখা যায় যে, ভেক সর্বাপেক্ষা অল্পশ্বাস গ্রহণ করে। ভেক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলেন — ভেক ১১০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে। নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে এরা ভূমির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পাঁচ মাস পর এপ্রিলের মধ্যভাগে বর্ষায়, আবার আত্মপ্রকাশ করে। এই পাঁচ মাস অনাহারে এবং শ্বাস গ্রহণ না করে বেঁচে থাকে।

॥ ওতম ॥

॥ আর্য সমাজের দশ নিয়ম ॥

- সব সত্য বিদ্যা এবং যা পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদিমূল পরমেশ্বর।
- ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত।
- বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম।
- সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকিবে।
- সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিত।
- সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।
- সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত।
- অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিত।
- প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, কিন্তু সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি ভাবা উচিত।
- সব মনুষ্যকে সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাইকে স্বতন্ত্র থাকা উচিত।